নারী নির্যাতন

নারী–নির্যাতন শুধু ভারতবর্ষের সমস্যা নয়, সারা বিশ্বের সমস্যা । বেশির ভাগ সময়েই মেয়েদের নির্যাতন করে তাদেরই ঘরের লোক, আত্মীয় স্বজন । ফলে নিজের বাড়িতেও অনেক মহিলাকে ভয়ে ভয়ে বাস করতে হয় । এই ধরণের নির্যাতনের মধ্যে শুধু শারীরিক মারধোরই নয়, যৌন–নির্যাতন, হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন, বা মানসিক ভাবে কষ্ট দেওয়াও পড়ে । মহিলাদের ওপর এ ধরণের অত্যাচার অনেক সময়ই ভয়াবহ রূপ নেয় ।

আগে মহিলাদের নির্যাতন সম্পর্কে সমাজে সচেতনতা ছিল না বললেই চলে । আজকাল খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই বধূহত্যার খবর প্রকাশিত হয় । মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে মহিলারা আত্মহত্যা করছেন, সে খবরও আমরা পাই ।

অনেক সময় আর্থিক কারণে মহিলাদের ওপর অত্যাচার করা হয় । বৃদ্ধা মহিলাকে মেরে ধরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া, না খেতে দেওয়া বা অন্যভাবে অত্যাচার করার খবর আমরা টিভি এবং পত্রিকায় দেখি । গ্রামে মহিলাদের ডাইনী আখ্যা দিয়ে তাদের ওপর অত্যাচার করা এখনও চলছে । বাড়িতে যেসব অল্পবয়সী মেয়েরা কাজ করে, তাদের কারণে অকারণে লাঞ্ছনা বা মারধোর আকছারই করা হচ্ছে । প্রাপ্তবয়স্ক হলেও নারীকে নিজের পছন্দমত জীবন সঙ্গী নির্বাচনের অধিকার থেকে সমাজ এখনও বঞ্চিত করে চলেছে । সমকামিতার কারণে বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে, এবং সমাজে মহিলাদের ওপর নির্যাতন এখনও চলে । সমকামী মহিলাদের ওপর সমাজের বিভিন্ন স্তরে চলে বৈষম্যমূলক ব্যবহার ও অত্যাচার ।

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন) যৌন নির্যাতন, পারিবারিক নির্যাতন, এবং শিশু ও নারী নির্যাতনকে ব্যাপক সামাজিক সমস্যা বলে ঘোষণা করেছে । এই সংস্থা মেয়েদের প্রতি সব রকম হিংসাত্মক আচরণ বন্ধ করার জন্যে প্রতি দেশকে আহ্বান জানিয়েছে । তবে প্রধানত পুরুষেরা মেয়েদের ওপর নির্যাতন করলেও, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্য মহিলারাও এ রকম অত্যাচারে অংশ নেন ।

মেয়েদের ওপর নানান ধরণের নির্যাতন বহুকাল ধরে সমাজে চলে আসছে, তাই অনেকে এতে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন । তাঁরা ধরে নেন সংসারে এই'ই স্বাভাবিক । বহু নির্যাতিতা নারীও বিশ্বাস করেন যে নিজের দোষেই তিনি মার খাচ্ছেন বা তাঁর কপালে সুখ লেখা নেই । পরিবারের মধ্যে নির্যাতনে বাধা দেওয়া বা এর প্রতিবাদ করার কোন অধিকার তাঁর নেই । আর যাঁরা নির্যাতন করেন, তাঁদেরও বিশ্বাস যে ধর্ষণ, মারধোর, আর যৌন–নির্যাতন করা, কিংবা শিশুদের গায়ে হাত তোলার অধিকার সমাজ পুরুষকে দিয়েছে । হয়তো আইনের বইপত্রে এ সব লেখা নেই, কিন্তু দরকার মত মহিলাদের, বিশেষত স্ত্রীকে মারধোর করে শাসন করা কোন অপরাধ হতে পারে না ।

মিনার কথা

বাড়ি থেকে সম্বন্ধ করে আমার বিয়ে দিয়েছিল ১৯ বছর বয়সে । লোকটি আমার চেয়ে প্রায় কুড়ি বছরের বড় ছিল । তার নিজের অনেক সমস্যা ছিল – মানসিক সমস্যাও । দেড় বছর আমাদের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু কোনদিন যৌন সম্পর্ক হয় নি । সে আমাকে যখন তখন মারত, অত্যাচার করত । দেড় বছর পরে আমি আর পারলাম না, ছেড়ে চলে এলাম । আমাদের ডিভোর্স হয়ে গেল ।

তার অল্প দিন পরেই বাড়ি থেকে আমাকে আবার বিয়ে দেয় । এই স্বামীর আগে বিয়ে হয়েছিল এবং দুটি সন্তান আছে । বিয়ের ছ' দিনের মাথায় সে বলল যে তার আর আমাকে ভালো লাগছে না । কেন এমন হল জানতে চাওয়াতে বলল, সে নাকি ভুল করে আমাকে ফর্সা ভেবেছিল – আসলে আমি কালো । তাছাড়া আমি নাকি প্রকৃত নারী নই, আমার কোন স্ত্রী লিঙ্গ নেই । এই অপবাদ চরমে উঠল যখন সে দু দুবার সকলের সামনে জোর করে আমাকে উলঙ্গ করে দাঁড় করাল এই প্রমাণ করতে যে আমার স্তন নেই! সকলের সামনে আমাকে বলল ১ কেজি করে দুটি স্তন না হলে সে আমাকে নেবে না ।

এরপর আমার ওপর প্রচণ্ড অত্যাচার আরম্ভ হল । আমাকে একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দু দিন পানি পর্যন্ত দেয় নি । তারপর আমার চাচা এসে ব্যাপারটা পঞ্চায়তে নেবার ভয় দেখাতে আমাকে পানি আর খাবার দেয় । আমার আব্বা আম্মা আর আমাকে সেখানে রাখতে রাজি হয় নি, বাড়ি নিয়ে আসেন । সে বলেছে আমি যদি আর তার কাছে যাই, তাহলে আমাকে পুড়িয়ে মারবে । আমার নিজের কানে শোনা, সে তার আম্মাকে বলছে যে আমার সঙ্গে শোবার আগে সে তার মেয়ের সঙ্গে শোবে ।

আমার বিয়ের শখ মিটে গেছে । কিন্তু আমরা ছ' বোন – ভাই নেই । আমার বিয়ে ভেঙে গেলে আমার বোনেদের বিয়ে হবে না । একটা যদি চাকরী পেতাম, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বাড়ির ভার কিছুটা হালকা করতে পারতাম ।

মানুষ যা দেখে তাই শেখে। শিশু যদি বাড়িতে মা–বাবা বা বড়দের মধ্যে নারীর প্রতি অবহেলা বা অত্যাচার দেখে তাহলে সে তাই শিখবে। যদি টিভি বা ছায়াছবিতে দেখি পুরুষের হাতে মেয়েরা যখন তখন চড়–থাপ্পড় খাচ্ছে, তাদের চুল টেনে শাসন করা হচ্ছে, বা তারা অন্যভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, তাহলে আমরাও এ ধরণের ব্যবহার স্বাভাবিক বলে ভাবতে শিখি। মনে করি আমাদের সমাজের এইই নিয়ম, এতে কোন দোষ নেই।

নারী নির্যাতন নিয়ে একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে নারী নির্যাতন শুধু মহিলাদের শারীরিক ভাবে আঘাত করাই নয়, তার ব্যক্তিসত্তাকে ক্ষুণ্ন করা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা। গোটা সমাজ ব্যবস্থা নারী নির্যাতন মেনে নেয় বলে পুরুষেরা এমন ব্যবহার করে পার পেয়ে যায়। নারী নির্যাতনের মধ্যে মারধোর, বিভিন্ন রকমের অত্যাচার, ধর্ষণ, যৌন নির্যাতন, গালিগালাজ, পর্দা–প্রথা, মানসিক অত্যাচার, হত্যা সবই পড়ে। তথাকথিত 'অনার কিলিং', অর্থাৎ পরিবারের সম্মান রক্ষার্থে নিকট আত্মীয়েরা যখন কোন মেয়েকে খুন করে তাও এই নির্যাতনের অন্তর্গত। অনার কিলিং ঘটে যখন কোন পরিবারের সদস্যেরা মনে করে যে তাদের কোন আত্মীয়ার ব্যবহারে পরিবারের সম্মান ক্ষুণ্ন হয়েছে এবং সেই হারানো সম্মান খুঁজে পেতে তারা 'দোষী' মেয়ে বা মহিলাকে খুন করে। পুরুষেরা ঘাতক হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলারাও খুনের চক্রান্তের শরিক হন। এছাড়া অন্যান্য নির্যাতন, যেমন জোর করে গর্ভপাত বা বন্ধ্যা করানো, কন্যা ভ্রুণহত্যা, নারী ও শিশু পাচার, চাপ দিয়ে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ, যৌন অত্যাচার দেখানো হচ্ছে বা যৌন অত্যাচারে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে এমন পর্ণোগ্রাফি, কাজে যৌন হেনস্থা, যৌনাঙ্গে আঘাত করা, যৌন–চিহ্ন বিকৃত করা – সব কিছুই নারী নির্যাতনের বিভিন্ন রূপ।

যে কোনও হিংসাত্মক কাজই ভয়াবহ এবং তা আমাদের সুস্থ জীবন যাপনে বাধা সৃষ্টি করে। যৌন নির্যাতন বিশেষ ভাবে বেদনাদায়ক কারণ যৌনাচরণ শুধু সন্তানসৃষ্টির জন্যে নয়, প্রিয়জনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মিলিত হয়ে ভালবাসার এক প্রকাশ। কিন্তু গত কয়েক দশক ধরে যৌনতা এবং হিংসা এক সঙ্গে সমাজে যুক্ত হয়ে গেছে। হিংসাত্মক যৌনাচরণ বা যৌন–নির্যাতন এখন অনেক পুরুষের কামোদ্রেক করে। আত্মসুখের জন্যে পুরুষেরা নারীদের কষ্ট দিতে এতটুকু অসুবিধা বোধ করে না।

আমাদের সমাজে শিশু ও মহিলাদের ওপর অত্যাচার বহু দিন ধরেই চলে আসছে। আগে এ সব লুকোনো থাকত চার দেয়ালের মধ্যে, বাড়ীর বাইরে এ নিয়ে আলোচনা হত না। ইদানীং এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের সচেতনতা বাড়ছে। নারী নির্যাতন যে একটা ব্যাপক সামাজিক সমস্যা তা বিভিন্ন দেশের প্রশাসনও মেনে নিয়েছে। ফলে সমস্যাটি মোকাবিলার জন্য বিধায়কেরা বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছেন। নির্যাতিতা মেয়েদের সহায়তার জন্য বহু সমাজ কল্যাণমূলক সংস্থা বা এন. জি. ও স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটি এত ব্যাপক এবং গভীর যে এটি দূর করা সহজ নয়। এর জন্যে সবাইকেই সচেতন ভাবে দীর্ঘ সংগ্রাম করতে হবে।

নারী নির্যাতনের স্বরূপ

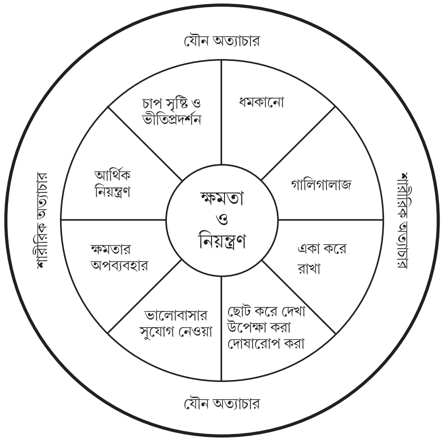

(সূত্র: ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ চক্রটি তৈরি করেছে ডোমেস্টিক অ্যাবিউস ইণ্টারভেনশন প্রোজেক্ট, ড্যালুথ, মিনেসোটা, ইউ এস এ)

অনেকে ভাবেন মেয়েদের উপর কোন পুরুষের অত্যাচারের মূলে রয়েছে তাদের ব্যক্তিগত মানসিক সমস্যা, যৌন অক্ষমতা, ছেলেবেলায় অত্যাচারিত হওয়া, মানসিক চাপ, মদ্যপান বা মাদকদ্রব্যের প্রভাব, ক্রোধ, অথবা আগ্রাসনে আসক্তি। এ সবই পুরুষের আগ্রাসী ব্যবহারে ইন্ধন যোগাতে পারে, কিন্তু এগুলোকে মূল কারণ মনে করলে নারী নির্যাতনের মত গূঢ় সমস্যার ব্যাখ্যা সঠিক হবে না।

নারীর প্রতি পুরুষের আগ্রাসনের মূল কারণ হল পুরুষের ক্ষমতা স্থাপন ও নারীকে নিয়ন্ত্রণ করার ইচ্ছা। এই সমস্যার মূলে রয়েছে পুরুষ ও নারীর সামাজিক ক্ষমতার পার্থক্য। শুধু আমাদের নয়, পৃথিবীর প্রায় সব সমাজেই পুরুষপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। মেয়েরা পুরুষের ওপর নির্ভরশীল এবং সমাজে তাদের ভূমিকা গৌণ। শৈশব থেকেই ছেলেদের উৎসাহ দেওয়া হয় যে তাদের বিজয়ী হতে হবে, পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় রাখতে হবে। ছেলেরা বিশেষ করে শিক্ষা পায়, যে প্রয়োজন মত বলপ্রয়োগ করে শত্রু দমন করতে হবে, নিজের অধিকার স্থাপন করে সকলকে দাবিয়ে রাখতে হবে। যখন নির্যাতনকারী তার স্ত্রী বা সঙ্গিনীকে ঘরে আটকে রাখে, তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে দেয় না, বা তাকে বাইরে বেরোতে বাধা দেয়, তখন সে সোজাসুজি তার প্রভুত্ব স্থাপন করছে।

এক দিক থেকে মনে হতে পারে এইভাবে মেয়েদের নিয়ন্ত্রণ করে বা হিংসাত্মক আচরণে দাবিয়ে রেখে পুরুষেরা লাভবান হচ্ছে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে নারীকে দাবিয়ে রাখলে পুরুষেরও ক্ষতি। স্ত্রীর উষ্ণ সান্নিধ্য বা ভালোবাসা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। নারীর মধ্যে পুরুষ সঙ্গিনী পাচ্ছে না, ভীত ত্রস্ত এক দাসী পাচ্ছে। এই সচেতনতা এখন পুরুষের মধ্যে ধীরে ধীরে আসছে। নারী নির্যাতন আর মানবিক অধিকার হরণ যে একই ব্যাপার তাও অনেকে উপলব্ধি করছেন। তবে এখনও যুদ্ধ বা দুটি গোষ্ঠির দ্বন্দ্বের সময়ে প্রতিপক্ষকে টিট করার সহজ উপায় হল তাদের আত্মীয়া নারীদের ধর্ষণ করা। তাই আন্তর্জাতিক ফৌজদারি ট্রাইব্যুনালে (ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল ট্রাইব্যুনাল) ধর্ষণকে এখন যুদ্ধাপরাধ (ওয়ার ক্রাইম) বলে গণ্য করা হচ্ছে। ধর্ষণ এখন আর শুধু পুরুষের হাতে একজন নারীর লাঞ্ছনা নয়, শত্রুকে বিধ্বস্ত করার এক অস্ত্র হিসেবে ধরা হচ্ছে। যুদ্ধ বা গোষ্ঠী সংঘর্ষের সময় গণধর্ষণ এখন সংগঠিত ভাবে মানবিক অধিকার লুণ্ঠন বলে ধরা হচ্ছে।

জাত, শ্রেণী, কুসংস্কার, এবং নারী নির্যাতন

নারী নির্যাতনের সঙ্গে জাতবিদ্বেষ ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা যুদ্ধ বিগ্রহের সময়ে বিধর্মী বা বিজাতীয় নারীদের ধর্ষণ করে শত্রুপক্ষকে জব্দ করার বহু কাহিনীই ইতিহাসে লেখা আছে। এই অত্যাচার নারী নির্বিশেষে ঘটে। নারী বলেই আমরা অত্যাচারের শিকার হতে পারি। তবে অত্যাচারিত হবার সম্ভাবনা নির্ভর করে আমাদের জাত, ধর্ম, বয়স, চেহারা, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদির ওপর। যে কোন দেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, নিচু জাতের, নিম্ন বিত্ত নারীর ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনা সব চেয়ে বেশি। এছাড়া যারা সহায় সম্বলহীন, বস্তিতে বা রাস্তায় থাকে, যারা আদিবাসী, যারা অল্পবয়সী বা যুবতী, যাঁরা থাকেন প্রতিবন্ধী, তাঁরা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী ধর্ষণের শিকার হন।

নির্যাতনের ফলে মহিলাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া

নির্যাতন ব্যাপারটা সমাজে প্রায় ব্যক্তিগত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। অথচ সারা বিশ্বের নারীদের এই একই অবস্থা। বেশির ভাগ সময় নির্যাতন হয় পরিবারের মধ্যে, গোপনে। ফলে অনেক নির্যাতিতা মহিলা মনে করেন এ শুধু তাঁরই সমস্যা এবং এ ব্যাপারে একা বোধ করেন। ইচ্ছে থাকলেও কার কাছ থেকে সাহায্য চাইবেন তাঁরা বুঝতে পারেন না। প্রিয়জনের হাতে নির্যাতিত হওয়ার সঙ্গে লজ্জা, অপমান, এবং দুঃখ জড়িত থাকে। অনেক সময় শারীরিক মারধোরের সঙ্গে যৌন-নির্যাতনও চলে। নির্যাতিত হওয়ার ফলে কোন মহিলার কি রকম প্রতিক্রিয়া হবে তা নির্ভর করে সে কি ধরণের আগ্রাসনের শিকার তার ওপর – ধর্ষণ, শারীরিক নির্যাতন, যৌন হেনস্থা, না শ্লীলতা হানি ও ছিনতাই। কোন নির্যাতিত মহিলার প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসা সৈন্য বা গুম (কিডন্যাপ) হয়ে আটকে থাকার পর মুক্তি পাওয়া মানুষের প্রতিক্রিয়ার খুব একটা তফাৎ হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে বা ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়লে মানুষের যা প্রতিক্রিয়া হয় তাকে ইংরেজিতে 'ট্রমা' বলে।

এই ধরণের মিল আছে বলে স্বাস্থ্যকর্মীদের নির্যাতিতার প্রতিক্রিয়া বুঝতে সুবিধা হয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলিকে বলা হয় 'পোস্ট-ট্রমাটিক ডিস-অর্ডার', অর্থাৎ ট্রমা-র পরবর্তী সমস্যা। 'পোস্ট-ট্রমাটিক ডিস-অর্ডার' সংক্রান্ত লক্ষণগুলি হল পুরনো অভিজ্ঞতার ভয়াবহ অনুভূতি হঠাৎ হঠাৎ ফিরে আসা, ঘটনাটির স্মৃতি ফ্ল্যাশব্যাক বা বারবার ছবির মত মনে পড়ে যাওয়া, ক্রমাগত দুঃস্বপ্ন দেখা, ঘুমোতে অসুবিধা হওয়া, হঠাৎ হঠাৎ প্রচণ্ড রেগে ওঠা, মনঃসংযোগে অসুবিধা, সব সময়ে ভয়ে পাওয়া, আর অল্পেই চমকে ওঠা।

নির্যাতিতাদের মধ্যে যে-সব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়

- নিজেকে দোষ দেওয়া
- ক্রমাগত অপমান এবং লজ্জায় ভোগা
- তীব্র ভীতি এবং নিরাপত্তার অভাব বোধ করা
- রাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ পাওয়া। রাগ সাধারণত নিজের ওপর হয় বলে মানসিক অবসাদ এবং আত্মহত্যার প্রবণতা থাকে
- মাদকদ্রব্য ব্যবহার আরম্ভ করা
- খাওয়া-দাওয়া নিয়ে সমস্যা
- নানান শারীরিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া, বিশেষ করে পেটের গোলযোগ এবং ব্যথা
- নিজেকে অহেতুক কষ্ট দেওয়া
- মনের মধ্যে সবসময় কিছু হারানোর কষ্ট জেগে থাকা
- অত্যাধিক অসহায় বোধ করা
- সবসময়ে একা বোধ করা
- বারবার দুঃস্বপ্ন দেখা, ফ্ল্যাশব্যাক বা পুরনো ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ে যাওয়া
- অল্প সময়ের জন্যে হলেও বাস্তবের সঙ্গে যোগ হারানো
- যৌন সম্পর্ক বা ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপনে অসুবিধা
- অন্যান্য আত্মিক বা আধ্যাত্মিক সমস্যা

সবার মধ্যে এই প্রতিক্রিয়াগুলো সমান ভাবে প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন মহিলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে এবং কম-বেশি এ লক্ষণগুলি দেখা দেয়।

নিজের জীবনকে পুনরুদ্ধার বা স্বাভাবিক অবস্থায় কী ভাবে ফিরিয়ে আনা যায়?

অত্যাচারের ফলে আমাদের যে মানসিক বা শারীরিক বিপর্যয় ঘটে, তার থেকে চট করে মুক্তি পাওয়া যায় না। সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে নিজেদের ওপর আমাদের আস্থা ফিরে আসে। নির্যাতনের শিকার হওয়ার পরে সুস্থ জীবন ফিরে পেতে কতগুলো বিশ্বাস মাথায় রাখতে হবে:

- যে অত্যাচার আপনার ওপর ঘটেছে, তার জন্য আপনি কখনই দায়ী নন। মেয়েদের গায়ে হাত তোলার স্বপক্ষে অনেক যুক্তি শোনা যায় যেমন, মেয়েটা নিশ্চয় কোন অন্যায় কাজ করেছে, স্বামীকে রাগিয়ে দিয়েছে, মেয়েটা খুব বাজে পোষাক পরেছিল, বা এমন কোন জায়গায় গিয়েছিল যা কেউ বরদাস্ত করবে না, ইত্যাদি। এর কোনোটাই কারোর গায়ে হাত তোলা বা তার ওপর অত্যাচার করার পক্ষে গ্রহণযোগ্য যুক্তি হতে পারে না।
- মনে রাখতে হবে মানুষ নিজের বিচার বুদ্ধি অনুসারে কাজ করে। অন্যের তা পছন্দ না হতে পারে কিন্তু তা নিয়ে মারধোরের অবকাশ নেই। কোন কিছু অপছন্দ হলে তা নিয়ে কথা বলে সমঝোতায় আসা সব সময়েই সম্ভব। আমাদের সমাজ মেয়েদের স্বাধীন ইচ্ছে বা ভালো লাগা সব সময় দাবিয়ে রাখতে চায়।
- মনের অনুভূতিগুলি আমাদের নিজস্ব। এর মধ্যে ঠিক বা ভুল বলে কিছু নেই। শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার রাস্তা প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই ভিন্ন। সুস্থ জীবনে ফিরে যাওয়া নির্ভর করে আমাদের সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থান, ইত্যাদির ওপর। এক একজন নারী এক এক ভাবে নিজেকে ফিরে পায়।
- নির্যাতনের পরে সব সময়েই সাহায্যের দরকার হতে পারে। সে জন্যে উদ্যোগী হয়ে এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। এঁরা মনের ক্ষত সারিয়ে তুলতে সাহায্য করতে পারেন। এ ব্যাপারে নারী নির্যাতন নিয়ে যে সমস্ত মহিলা সংস্থা কাজ করছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। অনেক সময় পরিবারের মধ্যেই কাউকে পাওয়া যায় যিনি এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারেন।
- নির্যাতনের ক্ষত সহজে মিলিয়ে যায় না, সময় লাগে। আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে।

নিজের জীবন-সঙ্গীর হাতে নির্যাতন

জীবন-সঙ্গীর হাতে নির্যাতন বা অত্যাচার পারিবারিক নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। এই অপরাধ বাইরের লোক সবচেয়ে কম জানতে পারে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মতান্তর, মনোমালিন্য ইত্যাদি অনেক সময়ে হতেই পারে। সঙ্গীর ওপর রেগে আগুন হওয়া, তুমুল তর্কবিতর্ক ও চ্যাঁচামেচি করা এ সব অবশ্যই ঘটবে। এতে মনে কষ্ট হতে পারে কিন্তু তাকে পারিবারিক নির্যাতন বলা যায় না। পারিবারিক নির্যাতনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নির্যাতিতার মনে ভয় ও বিভীষিকার সঞ্চার হওয়া।

একজন নির্যাতিতার নিজের কথায়

আমি যখন স্বামীর ঘর করতে এলাম, প্রথম কয়েকদিন সবকিছুই বেশ শান্ত ছিল। তারপর উনি জোর করে আমাকে দিয়ে অনেক কিছু করাতেন, যা আমি করতে চাইতাম না। আমি রাজী না থাকলেও উনি শুনতেন না। জোর করতেন, না করে আমার নিস্তার ছিল না।

কি ভাবে স্বামী জোর খাটাতেন তা এখানে স্পষ্ট করে না বলা হলেও বলপ্রয়োগ নানা ভাবে করা যায়। শারীরিক ভাবে, যেমন চড় থাপ্পড় ঘুঁষি মেরে, গলা টিপে ধরে, চাবুক মেরে, চুল ধরে টেনে, যৌন অত্যাচার করে। মানসিক ভাবেও জোর খাটানো যায় যেমন, সন্তান বা পোষা প্রাণীর ক্ষতি করার ভয় দেখিয়ে, গালিগালাজ করে, অস্ত্র দিয়ে আঘাত করার ভয় দেখিয়ে, কিংবা টাকা-পয়সা না দিয়ে, ঘরে আটকে রেখে, কারোর সঙ্গে মিশতে না দিয়ে। এ ধরণের আচরণ সব সময় করতে হয় না। এমন ব্যবহার মাঝেমাঝে প্রকাশ করে নির্যাতিতাকে ভয় পাইয়ে দিয়ে তার ওপর কর্তৃত্ব ফলানো যায়। এ রকম ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল নির্যাতিতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

পারিবারিক অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ নয়। অত্যাচারীকে ছেড়ে চলে যেতে গেলে সে অনেক সময়ে পেছু নেয়। নিজের স্ত্রী হলে তো কথাই নেই। 'আমাকে ছেড়ে গেলে শেষ করে দেব', এই হুমকি অনেক স্বামীই দিয়ে থাকেন। মহিলারাও ভয়ে সংসার থেকে বেরিয়ে যেতে পারেন না।

পারিবারিক নির্যাতনের ফলে বহু মহিলার মৃত্যু হয়েছে। অনেক সময়ে স্বামী বা পরিবারের কেউ তাদের পুড়িয়ে মেরেছে, গলা টিপে হত্যা করেছে, অথবা প্রচণ্ড মারের আঘাতে তাদের মৃত্যু হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে ক্রমাগত অত্যাচার সহ্য না করতে পেরে বধূটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। আমাদের দেশে বধূ-নির্যাতনের একটি উদ্দেশ্য হল বাপের বাড়ি থেকে আরও পণ বা টাকা আনা। তা না হলে অনেক সময়ে বৌটিকে হত্যা করা হয় বা আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা হয় যাতে ছেলের আবার বিয়ে দিয়ে পণের টাকা পাওয়া যায়।

অনেক সময়ে লোকে প্রশ্ন করে স্বামীর ঘরে বা জীবনসঙ্গীর হাতে অত্যাচারিত হওয়ার পরেও মেয়েরা কেন সেই অবস্থার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এর উত্তর একাধিক। বেশির ভাগ সময়ে মেয়েরা ভালোবাসার বন্ধনে আটকে পড়ে, মনে করে হয়ত এক সময় তার প্রিয়জনের শুভবুদ্ধি হবে, এ ধরণের ব্যবহার আর

করবে না। সুতরাং একটু ধৈর্যের অপেক্ষা। এছাড়া অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে রয়েছে আমাদের সমাজব্যবস্থা যা স্বামী ত্যাগ করলে মেয়েদের দোষারোপ করে, খারাপ চোখে দেখে। এ ছাড়া রয়েছে মেয়েদের আর্থিক নির্ভরতা। অনেক মেয়েরাই স্বাধীনভাবে উপার্জন করেন না এবং সে ক্ষমতা তাদের নেই। তাছাড়া লোকলজ্জা, স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য পারিবারিক চাপ, বাপের বাড়িতে স্থান না পাওয়া, সন্তানদের দুঃখ না দেওয়ার চেষ্টা, এ সব তো রয়েছেই।

পারিবারিক নির্যাতন ও আইন

সম্প্রতি আমাদের দেশে পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে অনেকেগুলি আইন সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমেই উল্লেখ করা যায় পুরনো একটি ধারা, যেটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮ (ক) হিসেবে পরিচিত। এটির সৃষ্টি হয়েছিল নারীর প্রতি তার স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়দের নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধের জন্যে। এই আইনে বলা হয়েছে স্বামী বা তার কোন আত্মীয় যদি নারীর ওপর নিষ্ঠুর আচরণ করে, তাহলে তার জন্যে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং সেই সঙ্গে জরিমানা হতে পারে। নিষ্ঠুরতার সংজ্ঞাও এতে দেওয়া হয়েছে:

- ইচ্ছাকৃত কোন আচরণ যা নারীকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেয় বা তাকে ঘোরতর ভাবে আহত করে, অথবা তার প্রাণ–সংশয়, অঙ্গহানি, বা স্বাস্থ্যহানি (শারীরিক বা মানসিক) ঘটায়।

অথবা

- নারীকে হেনস্থা করা। এই হেনস্থার উদ্দেশ্য সম্পত্তি বা মূল্যবান গচ্ছিতের ওপর বে–আইনী দাবী মেটানোর জন্যে নারী বা তার আত্মীয়কে চাপ দেওয়া, অথবা সেই বে–আইনী দাবী নারী বা তার আত্মীয় মেটায় নি বলে হেনস্থা করা।

নারীদের নির্যাতনের থেকে রক্ষার জন্য ২০০৫ সালে 'পারিবারিক নির্যাতন থেকে নারীর সুরক্ষা আইন, ২০০৫' নামে একটি সর্বাত্মক আইন সৃষ্টি করা হয়েছে। এই আইনে পারিবারিক নির্যাতন–এর সংজ্ঞা ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। পারিবারিক নির্যাতনের আওতায় পড়ে যে কোন দৈহিক, যৌন, মৌখিক, মানসিক বা আর্থিক–অত্যাচার যা নারীর ক্ষতি করতে পারে, তাকে আহত করতে পারে, তার স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, জীবন বা অঙ্গ–হানি ঘটাতে পারে, অথবা তার শারীরিক বা মানসিক সুস্থ জীবনযাপনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

(সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

রোকেয়া বেগম

এই সংগঠনে এখন আমি ২০ জনের একটি ক্ষুদ্র ঋণ (মাইক্রো ক্রেডিট) গোষ্ঠীর গ্রুপ লীডার। আমি খুব ভাল জরির কাজ করি – আমার কাজের কদর আছে। আমার বিয়ে হয়েছিল কিন্তু আমি যখন তিন মাসের অন্তঃসত্ত্বা তখন আমার স্বামী হঠাৎ চলে যায়। বহুদিন তাঁর কোন খোঁজ খবর পাই নি। আমার মেয়ে জন্মায় আমার বাপের বাড়িতে। তারপর আমার স্বামী আবার বাড়িতে ফেরে এবং আমাকে নিয়ে সংসার করতে মেটিয়াবুরুজে নিয়ে যায়।

আমার স্বামী আমাকে মারধর করত, আর কারোর সঙ্গে কথা বলতে দিত না, ঘরে বন্ধ করে রাখত। মেটিয়াবুরুজে গিয়েও কিছুদিনের মধ্যে সে আমাদের ছেড়ে পালিয়ে গেল। কি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়েছিলাম আমি! বুঝতে পারছিলাম আমাদের বাড়িওয়ালা খুবই খারাপ লোক। আমাকে অসহায় পেয়ে লাইনের ব্যবসায় নামিয়ে দেবে। কোন রকমে আমি গ্রামে ফিরে আসি। তারপর থেকে আমি ৭ বছর বাপের বাড়িতে আছি এবং স্বামীর বিরুদ্ধে আদালতে কেস এনেছি। সে কেস তুলে নিতে শেষ পর্যন্ত সে আমার সঙ্গে মোটা টাকার রফা করে। কেসটা ৪ থেকে ৫ বছর চলেছিল – আমিও আর টানতে পারছিলাম না।

সন্তানের ওপর মায়ের নির্যাতনের প্রভাব

ছেলেমেয়েদের পক্ষে বাবার হাতে মাকে মারধোর খেতে দেখা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। বাড়ির এই পরিস্থিতিতে অবশ্যই তারা ভয় ও শঙ্কা নিয়ে সময় কাটায়। বাবা ও মা দুজনই তাদের আপনজন ও অভিভাবক – দুজনের প্রতিই তাদের টান থাকে। সেখানে একজন অন্যজনকে মারছে, গালিগালাজ করছে, বা মানসিক কষ্ট দিচ্ছে দেখা অসহায় ছোট্ট মানুষদের মনে কি পরিমাণ কষ্ট ও নিরাপত্তার অভাব সৃষ্টি করবে তা কিছুটা অনুমান করা যায়। এসব বাড়ির বাচ্চারা নানান মানসিক সমস্যায় ভোগে। অনেকে বড় হয় এই ধারণা নিয়ে যে, কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে মারপিট করলেই চলবে। সমস্যা সমাধানের সেই একমাত্র পথ। এই ছেলেরাই বড় হয়ে আবার নিজের স্ত্রীকে মেরে শায়েস্তা করে, সন্তানদের মারধোর করে সিধে রাখে। অন্যদিকে কন্যা সন্তান শেখে নির্যাতন হজম করতে। তাদের ধারণা হয় মেয়েদের জীবনই এ রকম।

আপনি যদি অত্যাচারিতা হন, তাহলে কী করবেন

আপনি নিজে যদি নির্যাতনের শিকার হন তাহলে নিরাপদে থাকার জন্যে কয়েকটি কাজ করতে পারেন যা আপনার সন্তান ও আপনাকে কিছুটা নিশ্চিন্ততা দেবে। আর যদি চান তাহলে অত্যাচারী স্বামী বা সঙ্গীর থেকেও ধীরে ধীরে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে পাবেন। এ সব নির্দেশগুলো সবার ক্ষেত্রেই সমান কাজ করবে তা বলা যায় না। তবে এ সব তথ্য জানা থাকলে দৈনন্দিন জীবনে অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার পথ কিছুটা সহজ হতে পারে।

স্বামী যখন আপনাকে মারধোর করার চেষ্টা করছে তখন কি কি করতে পারেন

- যতটা সম্ভব মাথা ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা করুন।
- বলিশ বা অন্য কিছু দিয়ে নিজের মাথা এবং পেট আড়াল করার চেষ্টা করুন যাতে সেখানে আঘাত না লাগে। শরীরে যাতে কম আঘাত লাগে তার জন্য যা যা করতে পারেন করুন।
- সুযোগ পেলে ফোন বা মোবাইলে ১০০ ডায়াল করে পুলিশকে জানান। তা সম্ভব না হলে সাহায্যের জন্য চিৎকার করুন, যাতে পাড়া-পড়শী শুনতে পায়।

নিজের নিরাপত্তার জন্য কি কি করণীয়

- যদি মনে করেন আপনার পক্ষে শীঘ্র গৃহত্যাগ করা সম্ভব নয়, তাহলে নিরাপত্তার জন্যে প্রথমে আপনার নিকটবর্তী থানায় ফোন করুন।
- দেশে নারী নির্যাতন সংক্রান্ত যেসব আইন আছে সে সব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হোন। আপনার কাছাকাছি নারী-নির্যাতন নিয়ে কাজ করে যেসব এনজিও রয়েছে তাদের ফোন নম্বর ও ঠিকানা সংগ্রহ করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা তাদের জানান এবং তাদের কাছ থেকে জেনে নিন নিজের সুরক্ষার জন্যে আপনি কি কি করতে পারেন।
- একটি বন্ধুগোষ্ঠী গড়ে তুলুন যাঁরা আপনাকে বিপদে সাহায্য করতে পারবে।
- মারধোর বা অত্যাচার আরম্ভ হওয়ার আগে আপনার স্বামী বা সঙ্গী কী রকম ব্যবহার করেন বা কী ধরণের পরিস্থিতিতে তিনি নির্যাতন শুরু করেন সেগুলো বোঝার চেষ্টা করুন। সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারবেন।
- ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে রাখুন বিপদের সময়ে তারা কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।
- যেসব দরকারি ফোন নম্বর, ঠিকানা, এবং তথ্য আপনি জোগাড় করেছেন, সেগুলি পরিষ্কার করে লিখে এমন জায়গায় রাখুন যা আপনার অত্যাচারী স্বামী বা জীবনসঙ্গীর চোখে পড়বে না। দরকার হলে কোন বিশ্বস্ত বন্ধুর কাছে সেগুলো জমা রাখুন। এই তথ্যগুলি এক জায়গায় থাকলে প্রয়োজনের সময়ে খুবই কাজে লাগবে।

অত্যাচারী পুরুষের কিছু বৈশিষ্ট্য

মানসিক অত্যাচারের নিদর্শন

- গালাগাল দেওয়া বা আপনার কাজে নানান খুঁত ধরা
- আপনাকে নানা ভাবে দমিয়ে দেওয়া
- সবার সামনে এবং যখন তখন অপমান করা
- আপনার পছন্দের কারোর প্রতি বেশিমাত্রায় হিংসা প্রকাশ করা
- সব ভুল ভ্রান্তি এবং দুর্ঘটনার জন্যে আপনাকে দোষারোপ করা
- আত্মহত্যা করবেন বলে আপনাকে ভয় দেখানো
- আপনার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বারণ করা
- আপনাকে অর্থনৈতিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা অর্থাৎ টাকাকড়ি না দেওয়া
- মদ বা অন্য মাদকদ্রব্যে আসক্ত হওয়া
- আপনি বাইরে কাজ করতে বা উপার্জনশীল হতে চাইলে বাধা দেওয়া
- মিথ্যেকথা বলা
- নিজের অন্যায় ব্যবহার বা কাজ স্বীকার না করা

আগ্রাসী ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য

আগ্রাসী ব্যবহার আপনার বা আপনার পোষা জন্তুর প্রতি অথবা আপনার প্রিয় অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি হতে পারে।

- আকার-ইঙ্গিতে রাগ দেখানো
- জিনিসপত্র ভাঙচুর করা
- মারধোর করবে বলে ভয় দেখানো
- যৌন নির্যাতন করা, এমনকি আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে সঙ্গম করা
- দৈহিক নির্যাতন করা
- অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা

সব নির্যাতনই দোষণীয়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অত্যাচার ভয়াবহ আকার নিতে পারে, বিশেষ করে যখন স্বামী বা জীবনসঙ্গী নেশায় আসক্ত হয়, তার কাছে অস্ত্র থাকে, বা সে তার স্ত্রী বা সঙ্গিনীর দেহমনের ওপর পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চায়।

নির্যাতনকারীর সঙ্গে ঘর করেও কী করে নিজের সুরক্ষা বাড়ানো যায়

- সবসময়ে প্রয়োজনীয় ফোন নম্বরগুলো (যেমন, পুলিশ, হাসপাতাল, কয়েকজন বন্ধু, নারী সুরক্ষা সংস্থা, স্কুল ইত্যাদির) আপনার সঙ্গে রাখুন ও আপনার সন্তানদের দিন। এগুলি এমন জায়গায় রাখুন যা আপনার স্বামী বা জীবনসঙ্গী দেখতে না পান। যদি আপনার একটি মোবাইল ফোন থাকে তাহলে খুবই ভালো।
- বিশ্বস্ত কাউকে জানান যে আপনি নির্যাতিত হচ্ছেন। কোনও সহৃদয় প্রতিবেশীর সঙ্গে অলোচনা করে একটা সংকেত ঠিক করুন। আপনাকে মারধোর করার সময় সেই সংকেত করলে, প্রতিবেশী বুঝতে পারবেন যে আপনাকে নির্যাতন করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে তিনি তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দিতে পারবেন বা পাড়ার লোক জড়ো করে আপনাকে নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন।
- আগে থেকেই তিনচারটে জায়গা স্থির করে রাখুন যেখানে দরকার হলে আপনি আত্মগোপন করতে পারেন, যাতে স্বামীর বা জীবনসঙ্গী আপনাকে খুঁজে না পান। পালাবার কোন জায়গা যদি আপনার না থাকে তাহলে কতগুলো শেল্টার বা মহিলাদের জন্যে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ জেনে রাখুন। বাস্তুচ্যুত নারীদের থাকার আশ্রয় বা শেল্টারের একটি তালিকা নিজের কাছে রাখুন।
- যে সমস্ত নথিপত্র নিজের কাছে রাখতে চান, সেগুলি আগে থেকেই গুছিয়ে রাখুন।
- নিজের নামে একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট খুলুন। সেখানে যতটা পারেন টাকা জমাতে থাকুন। হাতের কাছে কিছু পয়সা সবসময়ে রাখবেন যাতে ফোনের খরচ বা বাস ভাড়া দিতে পারেন।
- কখন, কি ভাবে পালাতে পারেন তার একটা খসড়া মনে মনে তৈরি করে রাখুন। এ ব্যাপারে দু একবার মহড়া দিয়ে রাখুন যাতে বিশেষ দরকারের সময় সহজে পালাতে পারেন।
- সুরক্ষার জন্য যে প্ল্যানটি করেছেন তা মাঝে মাঝে যাচাই করবেন। অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তা বদলান।

যদি ঠিক করে ফেলেন যে আপনি স্বামী বা জীবনসঙ্গীকে ছেড়ে চলে যাবেন, তাহলে কি কি নথিপত্র বা জিনিষ সঙ্গে নেওয়া প্রয়োজনীয়:

- টাকাপয়সা, চেকবই, ব্যাঙ্কের পাসবই, ভল্ট থাকলে তার চাবি ও কাগজপত্র, ক্রেডিট কার্ড থাকলে সেটি, র‍্যাশন কার্ড, বিয়ের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, প্যান কার্ড, বার্থ সার্টিফিকেট, ড্রাইভার্স লাইসেন্স, বাড়ীর চাবি, পাসপোর্ট, কোর্টের কাগজপত্র, স্কুল কলেজের সার্টিফিকেট, বাড়ির দলিলপত্র, ইনসিওরেন্সের কাগজ, পুলিশে ডায়েরী করা হয়ে থাকলে তার নম্বর বা এফ. আই. আর–এর নম্বর, দরকারি ওষুধপত্র, জামাকাপড়। এছাড়া সন্তানের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।

তালিকাটি লম্বা এবং এর মধ্যে অনেক কিছু আপনার না থাকতে পারে বা সব কিছু আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কিন্তু যে নথিপত্র আপনার আছে তা সঙ্গে নেবেন।

কিছু নারী অধিকার সংক্রান্ত সংস্থা

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ
২৯/১ এ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন
কলকাতা ৭০০ ০১৯

সংহিতা
৮৯বি রাজা বসন্ত রায় রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৯৯–০৭৩৯, ৪০০০–৪৭৩০

উইমেনস ইণ্টারলিঙ্ক ফাউণ্ডেশন
২১/১ ওল্ড বালিগঞ্জ সেকেণ্ড লেন
কোলকাতা ৭০০ ০১৯
(টেলি) ২২৮১–৫৫০৮/৫৫০৭

দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি
(যৌনকর্মীদের সহায়ক সংস্থা)
১২/৫ নীলমণি স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০০৬
(টেলি) ২৫৪৩/৭৫৬০/৭৪৫১,
২৬৩০–৩১৪৮/৬৬১৯

সচেতনা
৩১ মহানর্বাণ রোড,
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬৩–৪৪৮৫

স্বয়ম
৯/২ বি দেওদার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০১৯
(টেলি) ২৪৮৬–৩৩৬৯/
৩৩৭৮/৩৩৫৭

সংলাপ
৩৮ বি মহানির্বাণ রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬৪–৯৫৯৬।

উইমেনস গ্রিভান্স সেল (সরকারী সংস্থা)
১৮ লালবাজার স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০১
(টেলি) ২২১৪–৫০৪৯/১৪২৯

ওয়েস্ট বেঙ্গল কমিশন ফর উইমেন
১০ রেইনি পার্ক, কলকাতা
(টেলি) ২৪৮৬–৫৩২৪/
৫৬০৮, ৫৬০৯

ইনস্টিটুট্যট অফ সোশাল ওয়ার্ক
২৯বি চেতলা রোড
কলকাতা ৭০০ ০২৭
(টেলি) ২৪৭৯–৬৬০৭

সরোজ নলিনী দত্ত মেমোরিয়াল
অ্যাসোসিয়েশন
২৩/১ বালিগঞ্জ স্টেশন রোড
কলকাতা ৭০০ ০১৯
(টেলি) ২৪৪০–৬৮৫২

টালিগঞ্জ উইমেন ইন নীড
৮ সি ড রাধাগোবিন্দনাথ সরণি
কলকাতা ৭০০ ০৩৩
(টেলি) ২৪১৭–৬১৬৪

এই সংস্থাগুলি বিভিন্ন ভাবে নির্যাতিত মহিলাদের সাহায্য করে। কাউন্সেলিং ছাড়াও এরা আইনী সাহায্য দিয়ে থাকে।

বাড়ি থেকে চলে যাবার পরে কী করবেন

☞ আপনার যদি জয়েণ্ট অ্যাকাউণ্ট থাকে, সেখান থেকে যত টাকা আপনার পক্ষে তোলা সম্ভব তা তুলে নিজের ব্যক্তিগত অ্যাকাউণ্টে জমা করুন।

☞ আপনি যে পথে কাজে যান, সে পথে না গিয়ে অন্য কোনও পথে যাতায়াত শুরু করুন।

☞ যে সব দোকানে বা জায়গায় আপনার স্বামী বা অত্যাচারী জীবনসঙ্গীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, সেসব জায়গায় যাবেন না।

☞ আপনার সন্তান যদি অন্য কারোর কাছে থাকে, তাঁকে সতর্ক করে দেবেন তিনি যেন বাচ্চাকে স্বামী বা নির্যাতনকারীর সঙ্গে ছেড়ে না দেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের সতর্ক করে দিন যে নির্যাতনকারী আপনার বাচ্চাকে অপহরণ করতে পারে। সে রকম সম্ভাবনা দেখা দিলে তাঁরা যেন পুলিশকে ফোন করেন।

☞ নির্যাতিতা হিসেবে নিজের সুরক্ষার জন্যে আপনি আদালত থেকে প্রতিরক্ষার নির্দেশ নিতে পারেন। এই সঙ্গে পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫ সম্পর্কে ভাল করে জেনে নিন। আদালত নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ বা অর্ডার দিলে তা ভালো করে বুঝে নিন এবং অর্ডারটি নিজের কাছে রাখুন। সেই নিষেধাজ্ঞা যদি নির্যাতনকারী ভঙ্গ করে তাহলে পুলিশকে জানাবেন।

☞ আপনি যে নির্যাতনের শিকার তা কর্মক্ষেত্রে কাউকে জানিয়ে রাখবেন। আপনার কাছে ফোন এলে তিনি যেন প্রথমে ধরে নিশ্চিত হন যে নির্যাতনকারী অপরপ্রান্তে নেই। নির্যাতনকারীর একটা ছবি অফিসের লোকদের দেখিয়ে রাখবেন যাতে আপনার কাছে সে এসে হাজির না হতে পারে। আদালতের নিষেধাজ্ঞা নির্যাতনকারীকে আপনার অফিসে আসতে বারণ করতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালতও সেই অর্ডারের একটা কপি আপনার অফিসে পাঠিয়ে দেবে।

নির্যাতিত মহিলাদের জন্যে কয়েকটি স্বল্পমেয়াদী আবাস

অল বেঙ্গল উইমেনস ইউনিয়ন
৮৯ এলিয়ট রোড, কলকাতা ৭০০ ০১৬
(টেলি) ২২২৯–৬২৯২

অ্যাসোসিয়েশন ফর সোশাল
হেলথ ইন ইণ্ডিয়া
৯ অশোক অ্যাভিন্যু, কলকাতা ৭০০ ০৪৭
(টেলি) ২৪৭১–১৫৯৯

জয়প্রকাশ ইন্সটিট্যুট অফ সোশ্যাল চেঞ্জ
ডি ডি ১৮/৮/১ সল্ট লেক সিটি
কলকাতা ৭০০ ০৬৪
(টেলি) ২৩৩৭–৬৬৯৫

সৌজাত্য
১১২ আশুতোষ কলোনী
কলকাতা ৭০০ ০০৮
(টেলি) ২৪১৬–৪৭৮৭,
২৮৭১–০৪৬৯

জনশিক্ষা প্রচার কেন্দ্র
৫৭ বি কলেজ স্ট্রীট,
কলকাতা ৭০০ ০৭৩
(টেলি) ২২৪১–৩৩২৪,
২২৫৭–১৪০৮

আইন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিবেচনা

নারী নির্যাতন কী ভাবে মোকাবিলা করতে হবে তার কোন নির্দিষ্ট পন্থা নেই। বিভিন্ন নারী বিভিন্ন ভাবে এর সমাধান খোঁজে। যদি কোন মহিলা এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নিতে চায় তাহলে তার জন্যে আইনের বিভিন্ন পথ খোলা আছে। পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ করার জন্যে প্রণীত বিশেষ আইন 'পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইন, ২০০৫'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই আইন পাশ হওয়ার আগে বিভিন্ন ব্যাপারে মহিলাদের আলাদা আলাদা মামলা দায়ের করতে হত, যেমন অত্যাচার নিবারণ, সন্তানের হেফাজত, উচ্ছেদ প্রতিরোধ, খোরপোশের জন্যে অর্থ, ইত্যাদি। এই আইনের বলে এখন একটি মাত্র অভিযোগপত্রের মাধ্যমে সব মামলা এক সঙ্গে দায়ের করা যাবে। ফলে প্রতিকারও দ্রুত হবে।

এই আইনটির ব্যাপ্তি বিশাল। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন থেকে শুরু করে মৌখিক ও অর্থনৈতিক নির্যাতনও এই আইনের আওতায় পড়ে। কোন নারীকে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া বা তার পছন্দের মানুষকে বিয়ে করতে বাধা দেওয়া, সন্তান না হাওয়ার জন্যে গঞ্জনা দেওয়া, পণ দেওয়া হয় নি বা কম দেওয়া হয়েছে বলে গালিগালাজ করা, মারধোর করা, এসব কিছুই শারীরিক, মানসিক, মৌখিক, বা আবেগগত নির্যাতনের মধ্যে পড়বে।

কোন নারীকে গৃহচ্যুত করার জন্যে ভাড়া বাড়িতে ভাড়া দেওয়া বন্ধ করা, তাকে চাকরি বা কাজ ছাড়তে বাধ্য করা, তার ভরণপোষণের দায়িত্ব না নেওয়া, সাচ্ছল্য থাকা সত্বেও খাবার, ওষুধপত্র, জামাকাপড়, ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত করা, নারীর উপার্জন ছিনিয়ে নেওয়া – আইনের চোখে এ সব আর্থিক অত্যাচার।

কোন নারীর প্রিয় শিশু বা পোষ্যকে শারীরিক নির্যাতনের হুমকি দেওয়া, শিশুদের জোর করে স্কুল বা কলেজ থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া, তাদের ওপর যৌননির্যাতন করা, বা মহিলাকে সন্তানসহ জোর করে বাড়িতে আটক করা – এগুলিও পারিবারিক হিংসা প্রতিরোধ আইনের আওতায় পড়ে।

এই আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রথমে লিখিত আবেদন করতে হয়। তারপর অভিযোগপত্র পাবার দিন থেকে তিন দিনের মধ্যে প্রথম শুনানির দিন ধার্য করা হয়। আবেদনকারিনী যে সমস্যার সমাধান চান, প্রথম শুনানির ষাট দিনের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট আইনগত আদেশ দিয়ে তার নিষ্পত্তির চেষ্টা করেন।

এই আইনের মাধ্যমে সুরক্ষা নির্দেশ পাওয়া যেতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগ পাওয়ার পর দুপক্ষের শুনানি করবেন এবং যদি প্রাথমিক ভাবে নিশ্চিত হন যে পারিবারিক অত্যাচার ঘটেছে, তাহলে নির্যাতিতার সুরক্ষার জন্য নির্দেশ জারি করতে পারেন। এই নির্দেশে বলা থাকবে যে নির্যাতনকারী –

- নিজে পারিবারিক নির্যাতন বন্ধ করবে।
- অন্য কাউকে পারিবারিক নির্যাতন করতে সাহায্য করবে না বা উৎসাহ দেবে না।
- নির্যাতিতা নারীর সঙ্গে কোন ভাবে যোগাযোগ করবে না, যেমন চিঠির মাধ্যমে, ফোনে কথা বলে, বা সামনা সামনি দেখা করে।
- নির্যাতিতা মহিলার কোন সম্পত্তি বিক্রি করবে না, যৌথ অ্যাকাউন্ট বা লকার থেকে কোন লেনদেন করবে না। স্ত্রীধন কিংবা যৌথ মালিকানার কোনও সম্পত্তি ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ছাড়া হস্তান্তর করবে না।
- নির্যাতিতা নারী যদি চাকরি করেন, তার কর্মস্থলে যাওয়া নিষিদ্ধ হতে পারে। কোন শিশুকে নির্যাতন করে থাকলে সেই স্কুলে যাওয়া নিষিদ্ধ হতে পারে।

কিছু সরকারী ও বেসরকারী আইনী পরিষেবা

লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ওয়েস্ট বেঙ্গল
৫ কিরণ শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা ৭০০ ০০১
(টেলি) ২২২১-১০৪৯, ২২৪৮-৩৯৮০

লিগ্যাল এইড সেণ্টার
১/২ শ্যাম বসু রোড
চেতলা, কলকাতা ৭০০০৪০
(টেলি) ২৪৭৯-৭৩২৯।

ফ্যামিলি কোর্ট (সরকারী বিভাগ)
ব্যাঙ্কশাল কোর্ট
৩ ব্যাঙ্কশাল স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১
(টেলি) ২২১০-১৬১৪

কৃত্তিকা
এল/সি ১ ও ডি আর সি হাউজিং
এস্টেট, কলকাতা ৭০০ ০৩৮
(টেলি) ২৪৭৮-৫৬১৭, ৬৪৫৬-৫৪৩৩

হিউম্যান রাইটস ল নেটওয়ার্ক
১ সোহিনী অ্যাপার্টমেন্ট
৩ পার্বতী চক্রবর্তী লেন
কলকাতা ৭০০ ০২৬
(টেলি) ২৪৫৪-৬৮২৮/৬৮১২

সোশিও লিগাল এইড রিসার্চ অ্যাণ্ড
ট্রেনিং সেন্টার
পি ১১২ লেক টেরাস
কলকাতা ৭০০ ০২৯
(টেলি) ২৪৬৪-৬০৯৮/৫৪৩০

ধর্ষণ

সাধারণত নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে বা তার সম্মতি ছাড়া তার সঙ্গে যৌন সঙ্গম করাকে ধর্ষণ বলে। কোন মেয়েকে ধর্ষণ করা মানে তার ওপর জোর করে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করা। মেয়েটির মতামতের এ ক্ষেত্রে কোন মূল্যই নেই; বরং তার আপত্তিকে গায়ের জোরে ধ্বংস করে পুরুষ আত্মসুখ ছিনিয়ে নিচ্ছে। আইনের বিচারে ধর্ষণের সংজ্ঞা সবদেশে এক নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে ধর্ষণ প্রমাণিত হবে যখন বাস্তবে যৌন-সংসর্গ ঘটেছে –

- নারীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে।
- নারীর সম্মতি ছাড়া।
- নারীর সম্মতি নিয়ে, কিন্তু সেই সম্মতি জোর করে আদায় করা হয়েছে তাকে বা তার প্রিয়জনকে আঘাতের ভয় দেখিয়ে।
- নারী যৌন সংসর্গের সম্মতি দিয়েছিল এই বিশ্বাসে যে পুরুষটি তার স্বামী। কিন্তু সেই পুরুষ নিজে জানে যে সে তার স্বামী নয়।
- নারী যখন সম্মতি দিয়েছিল তখন সে প্রকৃতিস্থ ছিল না, অথবা পুরুষটি বা অন্য কেউ মাদক বা বুদ্ধি নষ্ট করে এমন কোন বস্তু খাইয়ে তাকে নেশাগ্রস্ত করে দিয়েছিল। ফলে মহিলার পক্ষে সম্মতি দানের পরিণাম বোঝার ক্ষমতা ছিল না।
- নারী সম্মতি দিক বা না দিক – তার বয়স ১৬ বছরের কম।
- প্রসঙ্গতঃ, স্বামী ও স্ত্রীর যৌন-মিলনকে কখনোই ধর্ষণ বলে গণ্য করা হবে না। এর একমাত্র ব্যতিক্রম হতে পারে যদি স্ত্রীর বয়স ১৫ বছরের কম হয় অথবা আদালতের নির্দেশে স্বামী ও স্ত্রী আলাদা হয়ে গিয়ে থাকেন।

ধর্ষণ কি খুব একটা বড় সমস্যা?

সব দেশেই ধর্ষণ একটা বড় সমস্যা। ভারতবর্ষে প্রতিদিনই বহু নারী ধর্ষিতা হচ্ছেন। ন্যাশানাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো-র হিসেব অনুযায়ী ২০০৭ সালে ভারতবর্ষে ২০,৭৭১-টি ধর্ষণের মামলা রুজু করা হয়েছে। তার মধ্যে ৪০৫-টি ছিল ইনসেস্ট অর্থাৎ নিকট আত্মীয় দ্বারা (স্বজন) ধর্ষণ। ২০০৭ সালে সারা ভারতে যৌন-নিগ্রহ (সেক্সুয়াল মোলেস্টেশন) এবং যৌনহেনস্থা (সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট) সম্পর্কিত পুলিশ

রিপোর্টের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৮,৭৩৪ এবং ১০,৯৫০। এর মধ্যে ২০০৭ সালে পশ্চিমবঙ্গেই ২১০৬-টি ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছিল যার মধ্যে ১১৪-টি ছিল স্বজন ধর্ষণ। সারা দেশের মধ্যে নিকট-আত্মীয় দ্বারা বা স্বজন ধর্ষণের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশি ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ধর্ষণের মামলা দ্রুত হারে বাড়ছে। ২০০৬ সালে ১৭৩১-টি মামলা দায়ের করা হয়েছিল আর ২০০৭ সালে তার থেকে ৩৭৫-টি বেশি মামলা রুজু করা হয়। কিন্তু এগুলি হচ্ছে সরকারি হিসেব। আমাদের সমাজে বহু ধর্ষণের ঘটনা গোপন রাখা হয়, পুলিশের কাছে খবর পৌঁছয় না। সেগুলো ধরলে এই সংখ্যা যে আরও অনেক বেশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া আমাদের দেশে পত্নি-ধর্ষণ অর্থাৎ নিজের অনিচ্ছুক স্ত্রীর সঙ্গে জোর করে যৌন-সংসর্গ করাকে ধর্ষণ হিসেবে ধরা হয় না। অনেক দেশেই এ ধরণের ঘটনা ধর্ষণের মধ্যে পড়ে। আমাদের দেশেও যদি সেই আইন থাকত, তাহলে ধর্ষণের সংখ্যা নিঃসন্দেহে একটি বিশাল অঙ্কে পরিণত হত।

ধর্ষণের শিকার হলে কি করবেন?

যত তাড়াতাড়ি পারেন কাউকে সঙ্গে নিয়ে স্থানীয় পুলিশ স্টেশন বা থানায় গিয়ে অভিযোগ অর্থাৎ এফ. আই. আর করুন। শরীরের কোন অংশ ধুয়ে ফেলবেন না বা স্নান করবেন না, যাতে প্রয়োজনীয় প্রমাণ সংগ্রহ করা যায়, পুলিশকে অনুরোধ জানান 'বিশেষ' ডাক্তারী পরীক্ষার নির্দেশ জারি করতে। ধর্ষিতাকে পরীক্ষা করে ধর্ষণের আদালত-গ্রাহ্য প্রমাণ পুলিশের নির্দেশে কেবল অনুমোদিত সরকারী ডাক্তাররাই সংগ্রহ করতে পারেন। যে কোন ডাক্তারের পরীক্ষার রিপোর্ট আদালত গ্রহণ করবে না। মনে রাখবেন, ধর্ষণের ক্ষেত্রে দ্রুত ডাক্তারী পরীক্ষার প্রয়োজন। দুষ্কৃতিকারীর রক্ত, বীর্য, মুখের লালা, দেহলোম, ইত্যাদি যদি নারীর পোষাক বা শরীর থেকে সংগ্রহ করা যায়, তাহলে সেগুলি সনাক্তকরণ এবং আইনী প্রমাণের কাজে লাগে। ডাক্তার তাঁর রিপোর্ট ও সংগৃহীত প্রমাণগুলি পুলিশকে দেওয়ার পরে সেগুলি ফোরেন্সিক ল্যাবোরেটরিতে পাঠানো হবে। এ হল সরকারি নিয়ম কিন্তু অনেক সময়েই এগুলি ঠিকমত পালিত হয় না, ফলে দোষী বেকসুর মুক্তি পেয়ে যায়। তাই এ ব্যাপারে নিজেদেরই উদ্যোগী হতে হবে। থানার পুলিশ এফ. আই. আর নিতে না চাইলে পুলিশের উঁচু দফতরে যান। আগেই বলা হয়েছে, এ ব্যাপারে ডাক্তারী পরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। সে ব্যাপারেও আপনাকেই উদ্যোগী হতে হবে। ধর্ষণের সময়ে যে পোষাক পরেছিলেন, সেগুলি না ধুয়ে সেই অবস্থাতেই সঙ্গে নিয়ে যাবেন যাতে ডাক্তার সেগুলো পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন।

ধর্ষণের সময়ে শরীরের নানা জায়গায় আঘাত লাগতে পারে। এগুলি বর্ণনা করা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হলেও এগুলি গুছিয়ে ডাক্তারকে বলবেন যাতে ডাক্তার উপযুক্ত পরীক্ষা করে তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারেন এবং আঘাত কতটা গুরুতর তা বুঝতে পারেন।

ধর্ষণের ফলে অনেক সময়ে যৌনরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করবেন কোন ওষুধ খেতে বা ব্যবহার করতে হবে কিনা।

যাতে ধর্ষণের ফলে গর্ভসঞ্চার যাতে না হয় সে ব্যাপারেও ডাক্তার আপনাকে সাহায্য করতে পারেন। এ ব্যাপারে ডাক্তার কোন ওষুধ না দিলে কেন তা দেন নি জিজ্ঞেস করবেন।

(সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

ধর্ষণ থেকে সুরক্ষা

সাধারণত ধর্ষণকারীর সঙ্গে ধর্ষিতার পরিচয় থাকে। যদিও অপরিচিত লোকেরাও ধর্ষণ করতে পারে, কিন্তু সংখ্যায় তারা অপেক্ষাকৃত কম। যাদের দেখলে আপনার মনে অস্বস্তি হয়, তাদের সঙ্গে একা থাকবেন না। তারা কোন পানীয় বা খাবার দিলে সেগুলো খাবেন না। অনেক সময়ে নিজের মন দিয়ে আমরা মানুষ চিনতে পারি; কাকে বিশ্বাস করব আর কাকে করব না বুঝতে পারি। নিজের অনুভূতির ওপর আস্থা রাখুন। কেউ যদি আপনার উপর জোর খাটায়, অপমান করে, ভয় দেখায়, বা আপনার সঙ্গে অন্য কেউ কথা বললে রাগ করে, তাহলে সতর্ক হোন। অনেক সময় প্রিয়জন হিংসা করলে আমরা ভাবি সে আমাকে খুব বেশি ভালবাসছে। কিন্তু এ ধরণের অধিকারবোধ ও হিংসা পরে নির্যাতনে পরিণত হতে পারে। প্রথম থেকেই সরে যান। বাড়িতে একা থাকলে দরজা (গ্রিল না থাকলে জানলা) বন্ধ রাখুন। অপরিচিত কেউ দরজায় ধাক্কা দিলে চট করে দরজা খুলবেন না। চেনা হলেও তার সম্পর্কে যদি আপনার সন্দেহ থাকে, দরজা খুলবেন না। কোথাও যাওয়ার সময় যাকে সঙ্গী হিসাবে নেবেন সে যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়। অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত কারোর সঙ্গে একা একা কোথাও যাবেন না। নির্জন রাস্তায় সতর্ক হয়ে হাঁটবেন। চারিদিকে কি ঘটছে তার দিকে নজর রাখুন। অন্ধকারে বা যেখানে অনেক পুরুষ জটলা করছে, সেদিকে যাবে না, দরকার হয় ঘুরপথ নেবেন। ট্যাক্সিতে ড্রাইভারের পাশে অন্য কেউ থাকলে সেটায় উঠবেন না। ড্রাইভারকে দেখে অসুবিধা বোধ করলে সেই ট্যাক্সি নেবেন না। যাঁরা নিজেরা গাড়ি চালান, তাঁরা গাড়িতে ওঠার আগে দরজা খুলে দেখে নেবেন পেছনের সিটে কেউ লুকিয়ে আছে কিনা। গাড়িতে ঢুকেই গাড়ির দরজা সব লক করবেন। বিপদ দেখলে মোবাইলে ১০০ ডায়াল করে পুলিশের সাহায্য নিন। তবে কত তাড়াতাড়ি পুলিশ আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। চ্যাঁচাতে দ্বিধা করবেন না। চিৎকারে লোক জড়ো হবার সম্ভাবনা বেশি।

নিকট আত্মীয়ের ধর্ষণ ও শিশু–নির্যাতন

শিশুরা অনেক সময়ে নিকট আত্মীয়ের হাতে যৌন অত্যাচারের শিকার হয়। এ ধরণের নির্যাতন শুধু পুরুষই করে তা ভাববেন না। পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ বা নারী যে কেউ যৌন নির্যাতন করতে পারে এবং নির্যাতনের শিকার ছোট মেয়ে বা ছেলে দুজনেই হতে পারে। শিশু নির্যাতন অন্যেরাও করতে পারেন, যেমন শিক্ষক, বাড়িতে কাজের লোক, স্কুল বা বাড়ির দারোয়ান, ধর্মীয় গুরুদেব স্থানীয় ব্যক্তি, ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যবশত এইসব ব্যক্তিরা শিশুর সারল্য, নির্ভরতা, ও বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে এই অপকর্মে লিপ্ত হন। শুধু তাই নয়, এঁদের নির্দেশে ভয় পেয়ে শিশুরা অনেক সময়ই এই যৌন সম্পর্ক বা নির্যাতনের কথা কাউকে জানায় না। ফলে অনেক সময়েই এই নির্যাতন সকলের অজ্ঞাত থেকে যায়।

নব্বই দশকে দিল্লি এবং মুম্বাই–এ সাক্ষী, রাহি, এবং টাটা ইন্সটিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সের তিনটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে এদেশে ৪০ শতাংশের বেশি কিশোরী তাদের জীবনে যৌন নির্যাতন সহ্য করেছে। শুধু তাই নয়, সিংহভাগ যৌন নির্যাতনকারীরা এই কিশোরীদের নিকট আত্মীয় এবং তাদের পরিবারের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, যেমন পরিবারের বন্ধু এবং বাড়ির কাজের লোক।

কত শিশু এইভাবে নির্যাতিত হচ্ছে তা অনুমান করা প্রায় অসম্ভব। প্রথমত, এই নির্যাতনের কোনও সর্বজনগ্রাহ্য আইনী সংজ্ঞা নেই। কোন আচরণকে নির্যাতন বলে ধরা হবে সে ব্যাপারে দ্বিমত থাকায়, যেসব পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা সংকলিত করা সম্ভব হয় না। এছাড়া বহু নির্যাতনের কথাই গোপন থেকে যায়। যে ঘটনাগুলি জানা যায় সেগুলিও শিশুর স্মরণশক্তি ও প্রকাশ ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় সবসময় বোধগম্য হয় না বা বিশ্বাস করা যায় না। তবু গবেষকরা সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে অনুমান করেন যে পাঁচ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে অন্তত একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ছোট ছেলেদের মধ্যে নির্যাতিতের সংখ্যা তেরো জনের মধ্যে একজন।

শিশুদের যৌন–নির্যাতন নানান ভাবে করা হয়। যৌন কথাবার্তা বলা, দীর্ঘ চুম্বন, শরীর চটকানো, যৌনাঙ্গে হাত বা মুখ দেওয়া, যৌন সংসর্গ এবং পায়ু সংগম, ইত্যাদি যৌন নির্যাতনের মধ্যে পড়ে। অনেক সময়ে এ সমস্ত নির্যাতনের চিহ্ন শিশুদের শরীরে দেখা যায় না। কিন্তু শারীরিক আঘাত না লাগলেও এতে শিশুর মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তা জীবনভোর থেকে যায়। এই নির্যাতনের প্রভাবে শিশুর চরিত্র একেবারেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। তারা নিজেকেই দোষারোপ করে এবং বড় হয়ে গভীর আত্মগ্লানিতে ভোগে। যাঁরা শিশুকালে নির্যাতিত হয়েছেন, তাঁরা সাবালক হওয়ার পর ভাবেন কেন সাহস করে বাধা দিতে পারেন নি, কেন বড়দের জানাতে পারেন নি, কেন নির্যাতনকারীকে বিশ্বাস করেছিলেন, ইত্যাদি। যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়ার ফলে তাঁরা ভালোবাসার অযোগ্য সেই ধারণাও তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

শিশু বয়সে যাঁরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন, অনেক সময়ে দেখা যায় যে বড় হয়ে তাঁরা অনেকের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করেন। এই ভাবেই তাঁরা ছোটবেলার সেই কষ্টদায়ক স্মৃতি ও গ্লানি মন থেকে মুছে ফেলতে চান। যৌনমিলনের মাধ্যমে তাঁরা ভালোবাসা ও স্বীকৃতি খুঁজে বেড়ান। অনেকে একটু বড় হতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। অনেকে মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়ে অবসাদে ভোগেন অথবা মদ বা অন্য মাদকদ্রব্য খেয়ে দুঃখ ভোলার চেষ্টা করেন।

শিশু অবস্থা থেকে সঞ্চিত এই কষ্ট ও বেদনা কিছুটা লাঘব হয় যদি সংবেদনশীল কাউকে নির্যাতনের কথা অকপটে বলা যায়। শিশুকালে যাঁরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, অনেক সময় তাঁরা নিজেরাই নিজেদের জন্যে সহায়তা গোষ্ঠী গড়ে তোলেন। সেইরকম সহায়তা গোষ্ঠীতে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা ও ব্যথা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিলে মনের ভার কিছুটা কমানো যায়। এছাড়া মনোবিজ্ঞানী ও কাউন্সেলারের কাছে গিয়েও সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। আসলে অন্যদের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখলে এই কষ্ট বাড়ে বই কমে না। কেউ কেউ মনে করেন পরিবারের সবার উপস্থিতিতেই দোষীর অপকর্মের কথা প্রকাশ করা উচিত। এক দিক থেকে সেটি অত্যন্ত অস্বস্তিকর হলেও, ক্ষোভের এই বহিঃপ্রকাশ মনকে অবশ্যই কিছুটা শান্তি দিতে পারে। তবে নির্যাতিতের মানসিক পুনর্বাসনে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল প্রিয়জনের বিশ্বাস ও স্বীকৃতি। তার জীবনে যে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, সে যে সত্যি কথা বলছে তা বিশ্বাস না করলে নির্যাতিত মানুষ কখনও সুস্থ হয়ে উঠতে পারে না।

যৌন হেনস্থা

যৌন হেনস্থা নানান আকার নিতে পারে। কতগুলো উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যায়।

- আমার এক সহকর্মী আমাকে শুনিয়ে শুনিয়েই আমার জামা–কাপড় নিয়ে কুরুচিপূর্ণ এবং বিরক্তিকর মন্তব্য করে।
- আমার বস কথা বলতে বলতে প্রায়ই আমার গায়ে হাত দেন। এতে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করি। উনি অবশ্য ভাব দেখান যে হঠাৎ করে গায়ে হাত লেগে যাচ্ছে, এর মধ্যে কোন দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু বুঝতে পারি উনি ইচ্ছে করে আমাকে স্পর্শ করছেন।

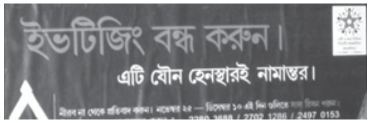

- আমার সামনে বসে আমার সহকর্মীরা অশ্লীল রঙ্গ–রসিকতা করে। আমি বিরক্তি প্রকাশ করলে বলে যে আমি হাসিঠাট্টা বুঝি না। আমার কোন রসিকতা বোধ নেই।
- আমি এক বাড়িতে রান্নার কাজ করি। বাড়ির বাবু প্রায়ই রান্না ঘরে এসে

আমার দিকে লোভী লোভী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। মাঝে মাঝে এটা ওটা এগিয়ে দেবার অছিলায় গায়ে হাত দেন।

- কোন কাজে আমার বস-এর ঘরে গেলে উনি প্রথমেই আমার চেহারা আর পোষাকের প্রশংসা করেন। কাজের চেয়ে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারেই ওঁর উৎসাহ বেশি। কথাবার্তায় আকারে ইঙ্গিতে উনি বুঝিয়ে দেন যে আমাকে ওঁর খুব পছন্দ। আমি ওঁকে প্রশ্রয় দিতে চাই না আবার ভয়ে কিছু বলতেও পারি না, কারণ আমার পদোন্নতি ওঁর মর্জির ওপরে নির্ভর করছে।

এ ধরণের অভিজ্ঞতা অনেক নারীর জীবনেই ঘটেছে। বেশির ভাগ মহিলাই মেনে নেন যে কাজ করতে গেলে এই ধরণের ঘটনা ঘটবে এবং সমাজের অন্যান্য অবিচারের মত যৌন হেনস্থাও মুখ বুজে সহ্য করতে হবে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুসারে যৌন হেনস্থা হল

- গায়ে হাত দেওয়া বা হাত দেওয়ার চেষ্টা করা।
- যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে ইচ্ছে প্রকাশ, দাবী, বা অনুরোধ করা।
- যৌন রসাত্মক মন্তব্য বা রসিকতা করা।
- অনিচ্ছুক মহিলাকে অশ্লীল ছবি বা বই প্রদর্শন করা।
- অন্য যে কোন অবাঞ্ছিত দৈহিক, মৌখিক বা ইঙ্গিতমূলক যৌন আচরণ করা।

এ ধরণের আচরণের প্রতিবাদ জানালে চাকরি চলে যেতে পারে, পদোন্নতি আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে, কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে এই নিরাপত্তার অভাব নারীকে এক পরম অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়। যৌন হেনস্থার ফলে জীবিকা অর্জনের অধিকার খর্ব হয়, মহিলাদের স্বাস্থ্য-হানিও ঘটতে পারে।

দেহ-ব্যবসায় ও পাচার

যৌনব্যবসায়ে সহজে অনেক টাকা রোজগার করা যায়, এই ধারণা আজকালকার কিছু কিছু কমবয়সী মেয়েদের মধ্যে দানা বাঁধছে। সাধারণ দেহোপজীবিনীদের কথা অবশ্য তারা ভাবছে না, এদের চোখে ভাসছে বিত্তশালীদের মনোরঞ্জনের জন্য যে-সব 'কল গার্লের' খবর পত্র-পত্রিকায় মাঝেমাঝে প্রকাশিত হয় সেগুলি। ধনীদের জন্যে যে দালালেরা কল গার্ল সংগ্রহ করে, তারাও এসকর্ট সার্ভিস বা কল-গার্লের কাজকে গ্ল্যামার দেবার চেষ্টা করে। তারা প্রচার করে এ কাজ একটা অ্যাডভেঞ্চার, সমাজের ক্ষমতাশালী পুরুষদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার সুযোগ, আলোকপ্রাপ্তা মেয়েদের কাছে সেক্স বা যৌন কাজ বড় কিছু নয় অথচ কয়েকঘণ্টায় অজস্র হাত খরচের টাকা পাওয়া যায়, ইত্যাদি। এই ধরণের কথা বলে কল-গার্লের ম্যাডাম বা দালালেরা স্কুল কলেজের মেয়েদের এই কাজের জন্যে সংগ্রহ করে। এছাড়া সরাসরি যৌনব্যবসায়ে প্রবেশ না করলেও দেহ ভাঙিয়ে ধনী হওয়ার ইচ্ছে বা নিজেদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত করার (যেমন ফিল্ম-এ অভিনয় করা, মডেল হওয়া, ইত্যাদি) প্রবণতা একটু একটু করে বাড়ছে। তবে জীবনধারণের জন্যে যাঁরা যৌনব্যবসায় বেছে নিয়েছেন, তাঁদের তুলনায় এই ধরণের মেয়েদের সংখ্যা খুবই কম। সাধারণ দেহব্যবসায় এক আধজন যে স্বেচ্ছায় যোগদান করেন না তা নয়, তবে প্রায় সবক্ষেত্রেই এ ব্যবসায়ে যোগ দেওয়ার মূল কারণ দারিদ্র।

স্বেচ্ছায় দেহব্যবসায় খুব অল্প নারীই বৃত্তি হিসেবে বেছে নেন। অথচ সমাজে দেহপোজীবিনীদের যা চাহিদা তা কখনই স্বেচ্ছায় যোগ দেওয়া মহিলাদের দিয়ে মেটানো যাবে না। সেইজন্যে দেহব্যবসায়ের চাহিদা মেটাতে বেশির ভাগ মেয়েদেরই পাচার করে আনা হয়। পাচারের সংজ্ঞা রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বিশদ ভাবে দেওয়া আছে। সেই সংজ্ঞা অনুসারে পাচার হল ভয় দেখিয়ে, জোর করে, বা অন্য কোন উপায়ে জুলুম করে, হরণ করে, প্রতারণা করে, ছলনা করে, ভুল বুঝিয়ে, অত্যাচার করে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, অথবা যার ওপর কর্তৃত্ব রয়েছে টাকা বা সুযোগ-সুবিধার লেনদেনের মাধ্যমে তার সম্মতি আদায় করে কোন শিশু, নারী, বা পুরুষকে সংগ্রহ করা, স্থানান্তরিত করা, হাতবদল করা, আটকে রাখা, বা নেওয়া। পাচারের প্রধান উদ্দেশ্য হল মানুষকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা ও তাকে শোষণ করা। নারী ও শিশুদের দেহব্যবসায় লাগানো হবে বলে সাধারণত এরাই পাচারের শিকার হয়। মহিলাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনকর্মে নিয়োজিত করা, বার বা পানশালায় নাচানো, অশ্লীল ছবিতে বা ফিল্ম-এ অংশগ্রহণ করানো এ সবই পাচারের উদ্দেশ্য। অনেক সময় এই মেয়েদের ভিনদেশী পুরুষদের যৌনলালসা মেটানোর জন্য বিয়ের নামে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

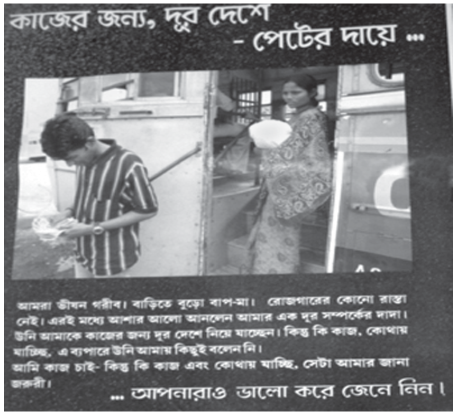
কাজের জন্য, দূর দেশে
- পেটের দায়ে ...

আমরা ভীষন গরীব। বাড়িতে বুড়ো বাপ-মা। রোজগারের কোনো রাস্তা নেই। এরই মধ্যে আশার আলো আনলেন আমার এক দূর সম্পর্কের দাদা। উনি আমাকে কাজের জন্য দূর দেশে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু কি কাজ, কোথায় যাচ্ছি, এ ব্যাপারে উনি আমায় কিছুই বলেন নি।
আমি কাজ চাই- কিন্তু কি কাজ এবং কোথায় যাচ্ছি, সেটা আমার জানা জরুরী।

... আপনারাও ভালো করে জেনে নিন।

> পাচার হওয়া মহিলাদের করুণ কাহিনীর মূল সুর নীচের জবানবন্দিতেই বোঝা যায়। কলকাতায় বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত একটি বাইশ বছরের মেয়ে কী ভাবে পাচার হল তার বর্ণনা দিয়েছেন:
> আমি এখানে নিজের ইচ্ছেতে আসি নি, আমায় বিক্রি করা হয়েছে। ওরা আমায় ওখানকার রাস্তা থেকে তুলে এখানে নিয়ে আসে – ওখানে কোন পুলিশ ছিল না। একজন ছিল, যাকে ওরা ঘুষ দিয়েছে। প্রথম দু-তিনদিন আমি লাইনে ঢুকতে (বেশ্যাবৃত্তিতে) রাজি হই নি। ঐ কদিন ওরা আমাকে খেতে দেয় নি, এমনকি জল পর্যন্ত দেয় নি। (সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

ইদানিং দেহোপজীবিনী, বেশ্যা, খানকি, ইত্যাদি কথার পরিবর্তে 'যৌনকর্মী' নামটির চল হয়েছে। শব্দটি হঠাৎ তৈরী হয় নি, এর পেছনে কিছু চিন্তা রয়েছে। যৌনব্যবসায়কে আইনের স্বীকৃতি দেবার জন্যে বেশ কিছু সংগঠন আলোচনা ও আন্দোলন শুরু করেছে। ভারতের বর্তমান আইন যৌনকর্মীদের প্রতি সহানুভুতিশীল না হওয়ার দরুন কিছু পুলিশ এবং সমাজবিরোধী এই মহিলাদের ইচ্ছেমত হেনস্থা ও শোষণ করে। অনেকে মনে করেন যৌনকর্মীর কাজ আইনত দণ্ডনীয় না হলে এই সমস্যা আর থাকবে না। কারখানার শ্রমিক বা অফিসকর্মী হওয়ার মত যৌনকর্মও হবে মেয়েদের একটা পেশা। যৌনকর্মীদের লাইসেন্স দেওয়া হবে এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গায় তাদের ব্যবসায় করতে দেওয়া হবে। এমন কি লাইসেন্স রিনিউ করার সময় এই মহিলাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে (যেহেতু যৌনকর্মীরা অনেকেই রোগাক্রান্ত পুরুষের সঙ্গ করে নিজেরাও যৌনরোগে আক্রান্ত হন এবং পরে অন্যান্য পুরুষকে সংক্রামিত করেন)। এছাড়া তাঁদের ট্যাক্স দিতে হবে, ইত্যাদি।

> বেশ্যাবৃত্তি সাধারণত ভারতে বে-আইনী নয়, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্যে যৌনতার ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ১৯৫৬ সালে প্রণীত দ্য ইম্‌মর‍্যাল ট্র্যাফিক অ্যাক্ট তৈরি হয়েছে যৌন ব্যবসায় বন্ধ করার জন্যে। এই আইনের উদ্দেশ্য হল নারী ও শিশু পাচার বা যৌনকর্মে নিযুক্ত করার জন্যে তাদের সংগ্রহ বন্ধ করা। এর মূল লক্ষ্য কাউকে ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেন যৌনব্যবসায় লিপ্ত না হতে হয়।

অন্যপক্ষে বহু নারীবাদী 'যৌনকর্মী' শব্দটি নিয়ে অসুবিধা বোধ করেন। তাঁদের বক্তব্য যৌনকর্ম কারখানার শ্রমিক বা অফিসকর্মীর মতো কোন পেশা নয়। এই বৃত্তির শ্রম আসল শ্রম নয়। এই বৃত্তিতে নিযুক্ত মহিলাদের মানবিক অধিকার প্রতি মুহূর্তে লঙ্ঘিত হয়, নারীরা পদে পদে ধর্ষিত হন। যৌনকর্ম শুধু দৈহিক অনিষ্ট করে না, মানসিক দিক থেকেও এই ব্যবসায় চূড়ান্ত রকম অনিষ্টকর। এই বৃত্তি তাঁরাই গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন যাঁদের জন্য এই সমাজে জীবনধারণের অন্যকোনও রাস্তা খোলা নেই। (সূত্র: অবসর ওয়েবসাইট)

যৌন ব্যবসায়ের কেন্দ্রবিন্দুতে নারী থাকলেও আসলে নারী এই ব্যবসায়ের বলি। পৃথিবী ব্যাপী বিশাল যৌন ব্যবসায়ে জড়িয়ে আছে একদল ব্যবসায়ী যারা নারীকে যৌন পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিনিয়ত লাভবান হচ্ছে। এরা ছাড়াও রয়েছে খদ্দের, দালাল, নারী পাচারকারী, নারী সংগ্রহকারী, বেশ্যালয় চালক, গুণ্ডা, দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ, রাজনীতিক, ও আরও অনেকে। এটি একটি অমানবিক ব্যবসায় যা নারীকে তার নিজের যৌনতা থেকে পৃথক করে ফেলে – তাকে যৌনযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে পুরুষের লালসা চরিতার্থ করে।

নিজের দেহের ওপর কর্তৃত্ব থাকা, নারীদেহকে ব্যবসায়ের পণ্য না করা, ইত্যাদি ব্যাপারে নারীবাদী সংগঠনের বক্তব্য খুব স্পষ্ট। তাঁরা বলেন বেশ্যাবৃত্তিকে আইনত স্বীকৃতি দেওয়া মানে মানবিক অধিকারের মূলে আঘাত করা। শুধু তাই নয়, এই স্বীকৃতি এলে সমস্যা আরও বাড়বে। এমনিতেই আমাদের দেশে আইন ও পুলিশী ব্যবস্থা শিথিল। আইনের স্বীকৃতি পেলে পাচারকারীরা আরও অবাধে তাদের কাজ চালাবে। আরও বহু অসহায় নারীকে এই চক্রের বলি হয়ে ইচ্ছের বিরুদ্ধে যৌনকর্মীর জীবনযাপন করতে হবে।

আত্মরক্ষার কৌশল

নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় অত্যাচারের শিকার হওয়ার আগেই অত্যাচারীকে আটকানো। আমাদের সক্রিয়ভাবে আত্মরক্ষার বিভিন্ন উপায় আয়ত্ত করতে হবে। এর জন্য শারীরিক এবং মানসিক প্রস্তুতি দুইই দরকার। আমাদের লড়াই করার আত্মবিশ্বাস যেমন গড়ে তুলতে হবে, তেমনি শারীরিক ভাবে আত্মরক্ষা করার কায়দাও রপ্ত করতে হবে। কখন কি উপায় ব্যবহার করলে আমরা নিরাপদ হব তা অবস্থার ওপর নির্ভর করছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা – সেইটে আমাদের মনে রাখতে হবে। নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে কোন অবস্থায় কি করা সম্ভব তা ঠিক করতে হবে। মনে রাখতে হবে একদিন হঠাৎ বন্ধু, প্রিয়জন, জীবনসঙ্গী, শিক্ষক, পিতা, বা স্বামীর কাছ থেকেও আত্মরক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। এই কথাগুলো ভাবতে কষ্ট হলেও এ ধরণের পরিস্থিতির সম্ভাবনা সব সময়েই থাকে এবং তখন কী ভাবে আত্মরক্ষা করা যায় তার একটা ছক ভেবে রাখতে হবে।